
লক্ষ্মীবাই
D.G.

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্ত্তার নূতন শিক্ষাধারা অনুসারে বিদ্যালয়সমূহের **তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর** উপপাঠ্যরূপে লিখিত

আর্য্যলক্ষ্মী সিরিজের দ্বাদশ গ্রন্থ

লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীঅণিমা দেবী
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

সংশোধিত সংস্করণ
কার্ত্তিক, ১৩৬১

মুদ্রাকর—
এস, সি, মজুমদার
দেব প্রেস
২৪নং ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা ৯

মূল্য
ছয় আনা





"এ সামান্য মেয়ে নয়, এ যে রাজরাণী হবে !"

—৭ পৃষ্ঠা

লক্ষ্মীবাঈ

এক

ভারতবর্ষেরই এক অংশের নাম মহারাষ্ট্র বা মারাঠা। প্রায় দেড়শ' বছর আগে সেই মারাঠা দেশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর নাম মোরোপন্ত।

সে যুগে মারাঠা দেশ যাঁরা শাসন করতেন, তাঁদের উপাধি ছিল 'পেশোয়া', ঠিক আমাদের রাজার মত। তখন পেশোয়া ছিলেন বাজী রাও। বাজী রাওএর এক ভাই, নাম তাঁর চিমাজী আপ্পে। ব্রাহ্মণ মোরোপন্ত এই চিমাজী আপ্পের কাছে চাকুরী করতেন। তিনি ছিলেন তাঁর দেওয়ান। কাজেই সংক্ষেপে বলা যেতো, মোরোপন্ত চাকুরী করতেন রাজার এক ভাইএর কাছে। তাঁর মান-মর্য্যাদাও খুব কম ছিল না।

পেশোয়া বাজী রাও বাস করতেন বিঠুরে আর তাঁর ভাই চিমাজী আপ্পে বাস করতেন কাশীধামে। সুতরাং স্ত্রী ভাগীরথী বাঈকে নিয়ে মোরোপন্তকেও কাশীতেই থাকতে হতো।

ভালই ছিলেন তাঁরা। তাঁরা প্রতিদিন নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন, সন্ধ্যাহ্নিক করেন, আর মা অন্নপূর্ণার চরণে কেঁদে তাঁদের মনের কামনা জানান, "একটি সন্তান দাও মা!"

অবশেষে মা অন্নপূর্ণা মুখ তুলে চাইলেন। ইংরেজী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ১৮ই নভেম্বর, শুভদিনে শুভক্ষণে, তাঁদের একটি কন্যাসন্তান হলো। মেয়ের রূপের ছটায় ব্রাহ্মণের কুঁড়ে ঘর যেন আলো হয়ে উঠলো! তাঁরা আদর করে মেয়ের নাম রাখলেন মনু বাঈ।

কিন্তু সেই সুখের সংসারে সহসা একদিন এসে গেলো বিপদের কালো-মেঘ! মনু বাঈ যখন মাত্র সাড়ে তিন কি চার বছরের শিশু, সেই সময় তার মা চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে! মোরোপন্তের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো!

এই আঘাত সামাল করে উঠতে না উঠতে হলো অপর এক নতুন বিপদ্! মোরোপন্তের আশ্রয়দাতা চিমাজী আপ্পেও একদিন পরলোকে চলে গেলেন!

মোরোপন্তের চোখের সামনে অন্ধকার ফুটে উঠলো। শিশুকন্যাকে নিয়ে কি যে তিনি করবেন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু এ বিপদে তাঁকে উদ্ধার করলেন স্বয়ং পেশোয়া বাজীরাও! ভাই চিমাজী আপ্পের কর্ম্মচারী, মোরোপন্তকে তিনি তাঁর শিশুকন্যাসহ, নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। কাজেই মোরোপন্ত ও তাঁর শিশুকন্যা মনু বাঈয়ের তখন হতে আশ্রয় হলো বিঠুর-রাজপ্রাসাদ।

মনু বাঈয়ের ফুট্‌ফুটে চেহারা, চঞ্চল খেলাধূলা ও মধুর আবোল্-তাবোল্ বুলি প্রাসাদের সকলকেই মুগ্ধ করে ফেললো। আদর করে তাঁরা সকলেই তার নাম দিলে "ছবেলী"! মারাঠী ভাষায় "ছবেলী" শব্দের মানে হলো "ময়না"।

রূপের ডালি ছবেলী প্রাসাদের এখানে-সেখানে ঘুরে ফিরে বেড়ায় আর হরবোলার মত কত কথাই বলে! অতি অল্প দিনের মধ্যে বাজীরাওএর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেলো। ছবেলী ও নানা সাহেব, এরাই হলো একে অন্যের খেলার সাথী। নানা সাহেব তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে, শিকারে যায়, অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে; ছবেলীও তাতে যোগদান করে। সকলেই ভাবে, একি পুরুষ না মেয়ে?

সে কখনো বউ সাজে, পুতুলের বিয়ে দেয়, রান্নাবান্না করে, মাটির গুঁড়ো দিয়ে ভাত রান্না করে, মাটির পিঠে ভাজে, পূজোর বাসন সাজিয়ে দেয়; আবার ছেলের মত পাল্কী বয়ে সে বউ নিয়ে আসে, বিয়ের আসরে ঢুলি হয়, বাজার থেকে খাবার নিয়ে আসে, ঠাকুরবাড়ীতে পাঁঠা কাটে। মেয়েদের কোমল কাজ আর ছেলেদের কঠিন কাজ, সবই সে সমান ভাবে করে। দুটি ভিন্ন প্রকৃতি এই মেয়েটির মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগলো।

দিনের পর দিন মেয়েটি বড় হয়ে ওঠে। এখন সে ঘোড়ায় চড়ে, হাতীর পিঠে লাফিয়ে ওঠে, আগুনের ভিতর ঝাঁপ দেয়, তরোয়াল খেলে, পুরুষের সঙ্গে লড়াই করে, চোখ দুটো টান করে দুপুরে সূর্য্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! মনে হয়, ছবেলী যেন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার শক্তি-পরীক্ষা করতে চায়!

দুই

মনু বাঈ বা ছবেলী ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলো। এখন বিয়ে দিতে হবে। ব্রাহ্মণ মোরোপন্ত ভেবে ভেবে অস্থির! তিনি পাত্র খুঁজতে লাগলেন।

হঠাৎ এক জ্যোতিষীর সঙ্গে তাঁর দেখা। বালিকার জন্মপত্রিকা দেখবার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁকে ধরে বসলেন। জ্যোতিষী গণনা করে বল্লেন, "এ সামান্য মেয়ে নয়, এ যে রাজরাণী হবে!"

মোরোপন্ত এ কথা বিশ্বাস করলেন না! কারণ, এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য!

কিন্তু বাতাস কখন কোন্ দিকে ফেরে, মেঘ কখন আকাশে জমাট বাঁধে,

কেউ বলতে পারে না! ব্রাহ্মণ যখন মেয়ের পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন,—ঠিক সেই সময় ঝাঁসির রাজা গদাধর রাওয়ের স্ত্রী মারা গেলেন। রাজার আবার বিয়ে না করলে চলে না। তাই দেশ-বিদেশে লোক ছুটলো পাত্রীর সন্ধানে।

মোরোপন্তকে জ্যোতিষী বললেন, "রাজা গঙ্গাধর রাওএর সঙ্গে মনু বাঈয়ের বিবাহ-প্রস্তাব করে লোক পাঠিয়ে দাও।"

মোরোপন্ত হেসেই উড়িয়ে দেন! কিন্তু জ্যোতিষীর তবু আগ্রহ। মোরোপন্ত তখন তাঁকে বলেন, "তাহলে সেই প্রস্তাব নিয়ে আপনিই যান ঠাকুরমশাই!"

পেশোয়া বাজীরাও নিজে এক অনুরোধ-পত্র লিখে দিলেন, জ্যোতিষী সেই চিঠি নিয়ে ঝাঁসিতে চলে গেলেন!

মহারাজ গঙ্গাধর রাও বালিকার রূপের কথা, গুণের কথা, গ্রহফলের কথা, সকলই শুনলেন। শুনে তিনি ঠিক করলেন, পাত্রীটিকে দেখবার জন্যে কয়েকজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেবেন।

রাজার হুকুম পেয়ে কয়েকজন রাজ-কর্ম্মচারী মোরোপন্তের কুটীরে উপস্থিত। মা জগদম্বার নাম স্মরণ করে, ব্রাহ্মণ কাঁপতে কাঁপতে তাঁর মা লক্ষ্মীকে তাদের সাম্‌নে এনে দাঁড় করালেন।

মেয়ের রূপ দেখে রাজ-কর্ম্মচারীদের চোখ যেন ঝল্‌সে গেলো! শত শত মেয়ে তারা দেখেছে, কিন্তু এ রকম রূপ তো তাদের চোখে কখনো পড়ে নাই! এ যেন সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা!

রাজার লোকেরা রাজধানীতে ফিরে গিয়ে মহারাজকে সব কথা খুলে বল্লে। তারপর অতি অল্পকালের মধ্যেই মনু বাঈ ও রাজা গঙ্গাধর রাওএর বিবাহ সুস্থির হয়ে গেলো।



মেয়ের রূপ দেখে রাজকর্ম্মচারীদের চোখ যেন ঝল্‌সে গেল !

রাজার বিয়ে—জাঁক-জমকের শেষ নাই। নাচ, গান, বাজনায় রাজ্যে সাড়া পড়ে গেল। লোকের ভিড়ে রাজপুরী গম্ গম্ করতে লাগলো। ঝাঁসি যেন উৎসবে মেতে উঠলো, আনন্দে ভরপূর হলো! মা আনন্দময়ীর আগমনে এমনি ভাবেই আনন্দের ঢেউ ওঠে।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিয়ে হয়ে গেল। ঝাঁসিতে রাজা ছিলেন, রাজার ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু এতদিন রাজশ্রী ছিল না। পুরীর ভিতর প্রবেশ করলে মনে হতো, সমস্ত পুরী যেন অন্ধকার! অনেক দিন পরে রাজলক্ষ্মীর আগমনে সমগ্র ঝাঁসি যেন হাসি ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

দেশশুদ্ধ সকলেই বললো, "এতদিনে যথার্থ ই মা লক্ষ্মী এসেছেন!"

সেই থেকেই মনুবাঈএর নাম হলো 'লক্ষ্মীবাঈ'। জ্যোতিষীর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল, কুটীরবাসিনী মনুবাঈ হলেন রাজরাণী লক্ষ্মীবাঈ!

তিন

মহারাজ গঙ্গাধর রাও নতুন রাণীকে নিয়ে পরম সুখে ঘর করছেন। রাণী যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী; কাজেই রাজার সুখের সীমা নাই।

কিছুদিন পরে ভগবানের আশীর্ব্বাদে রাজা গঙ্গাধর রাও একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজ্য জুড়ে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। রাজ্যশুদ্ধ লোক এই সংবাদে আমোদে মেতে উঠলো! শিশুর অপরূপ রূপের আলোয় রাজবাড়ীতে যেন নতুন আলোর বান ডাকলো!

ছেলের মুখ দেখে মহারাজের আজ কত আনন্দ! দিন-রাত নহবৎ বাজতে লাগলো। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মহারাজ হাজারে হাজারে মুদ্রা দান করলেন। রাজবাড়ীতে কাঙ্গালী-ভোজনের ধুম পড়ে গেল। পথে ঘাটে,

ভিতরে বাহিরে, ছোট বড় সকলের মুখে হাসি আর ধরে না! যে কেউ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়, সেই তুষ্ট হয়ে রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে যায়। দেখতে দেখতে দুই-তিন মাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রাজ্যের লোক শুনে শিউরে উঠলো, ননীর পুতুল রাজকুমারের সাংঘাতিক অসুখ!

রাণীর আর খাওয়া-দাওয়া নাই, চোখে ঘুম নাই, পাগলিনীর মত ছেলেকে কোলে নিয়ে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর ঝর্‌ঝর্‌ করে চোখের জল ফেলেন।

তারপর শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য কত চিকিৎসা, কত চেষ্টাই হলো! কিন্তু একমাত্র প্রাণের পুতুলি আদুরে দুলাল একদিন ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল। পুত্রশোকে রাজা ও রাণীর বুক ভেঙ্গে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

রাজা গঙ্গাধর রাও পুত্রশোকে এমন আঘাত পেলেন যে, তিনি আর দীর্ঘকাল তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর দেহ ও মন একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো। অল্প দিনের মধ্যেই তিনিও রাজ্যশুদ্ধ লোককে কাঁদিয়ে, মহারাণীকে একলা ফেলে পরলোকে চলে গেলেন। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে মহারাজ গঙ্গাধর রাও একটি দত্তক গ্রহণ করে গেলেন। এই দত্তক পুত্রের নাম দামোদর রাও।

বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ শিশু দামোদর রাওকে বুকে নিয়ে অকূল পাথারে ভাসলেন!

———

চার

ঝাঁসির মহারাণী আজ পাষাণে বুক বেঁধেছেন। দেহে তাঁর কোন রকম বেশ-ভূষা নাই, তাঁর মুখে কেউ আর হাসি দেখতে পায় না।

দিন-রাত জপের মালা নিয়ে তিনি বসে থাকেন। গভীর রাত্রেও তাঁর চোখে ঘুম নাই, একমনে ভগবানের আরাধনা করছেন। ধর্ম্ম ছাড়া অন্য দিকে আর তাঁর মন নাই। কিন্তু রাজ্যরক্ষাও ধর্ম্ম, তাই তিনি রাজকার্য্যেও মন দিলেন।

তিনি প্রত্যেক দিন দুপুর বেলা নিজের প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের কথা মন দিয়ে শুনতেন আর ভগবানের নাম নিয়ে উচিত বিচার-ব্যবস্থা করতেন। আর মহালক্ষ্মীর পায়ে শত-শত বার মাথা কুটে ঝাঁসির মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করতেন।

এইভাবে কেটে যায় মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর। সুদীর্ঘ তিন-তিনটি বছর এম্‌নিভাবেই কেটে গেল। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাঈ কিছুতেই স্বস্তি পান না। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক তাঁর কেঁপে ওঠে!

লর্ড ডালহৌসী তখন ভারতের বড়লাট। তিনি তখন ছুতোনাতায় দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করে ইংরেজের সাম্রাজ্য-বিস্তারে ব্যস্ত। মহারাজ গঙ্গাধর রাও তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করে বুন্দেলখণ্ডে ইংরেজের যে প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর নামে এক চিঠি লিখে যান। চিঠিতে অনেক কথাই ছিল। তাঁর পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র রাওএর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের যে সন্ধিপত্র হয়, তাতে লেখা ছিল ঝাঁসির গদী তাঁর বংশেই বজায় থাক্‌বে। এ কথাটা তিনি চিঠিতে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। অবশ্য ভুলে যাবার কথা নয়; তবুও তিনি মনের আবেগে সেই পুরাণো স্মৃতি একবার জাগিয়ে তোলা আবশ্যক মনে করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ন্যায়বান্ ইংরেজ

সরকার অবশ্যই তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা করবেন ও তাঁর দত্তক পুত্র দামোদর রাওকেই ঝাঁসির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিবেন !

কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। রাজার মৃত্যুর পর বুন্দেলখণ্ডের ইংরেজ-প্রতিনিধি বড়লাটকে এক চিঠি লেখেন, "ঝাঁসির মহারাজ গঙ্গাধর রাও পরলোক গমন করেছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দত্তক রেখে তাকে ঝাঁসির গদীতে বহাল রাখার জন্যে এক চিঠি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই দত্তক পুত্র ঝাঁসির সিংহাসন পেতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যদি আমার সন্দেহ ঠিক হয়, তা হলে ইংরেজ-সরকার ঝাঁসি নিজের হাতে নিয়ে রাণীর মান-সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যে মাসে মাসে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দিতে পারেন।"

মাসের পর মাস চলে গেল, ঝাঁসির চিঠির কোন উত্তর নেই। ছেলে গেছে, স্বামী গেছে, ঝাঁসিও বুঝি চলে যায়, এই কথা ভেবে ভেবে মহারাণী বড়ই ব্যাকুল হলেন। অবশেষে মহারাণী নিজেও একখানা চিঠি লিখলেন বড়লাটের কাছে। তাতে লেখা ছিল—ঝাঁসির সমস্ত বৃত্তান্ত, আর ছিল দত্তক পুত্রকে গদীতে বহাল রাখার জন্য রমণীর কাতর প্রার্থনা।

কিন্তু বড়লাটের হুকুম হলো, ঝাঁসি স্বাধীন রাজ্য নয়, সম্পূর্ণ ইংরেজের অধীন। ইংরেজ-সরকারের অনুমতি ভিন্ন ঝাঁসির মহারাজের দত্তক গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তিনি যে দত্তক রেখে গিয়েছেন, তাকে ঝাঁসির সিংহাসনের অধিকারী বলে ইংরেজ-সরকার স্বীকার করেন না। কাজেই মহারাজ গঙ্গাধর রাওএর মৃত্যু হওয়ায় ঝাঁসি এখন রাজা-শূন্য। ইংরেজ-সরকার নিজহাতে এখন ঝাঁসি রাজ্য গ্রহণ করলেন। অবশ্য রাণীর যাতে মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, সে বিষয়ে সরকার বাহাদুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। মাসে মাসে রাণীসাহেবা পাঁচ হাজার টাকার বৃত্তি পাবেন।

ঝাঁসির দত্তক পুত্রকে ইংরেজ-সরকার নামঞ্জুর করলেন। ইংরেজ ঝাঁসি নিজের হাতে নিলেন, এই নিদারুণ সংবাদ শুনে রাণী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। হায়, হায়, সব গেল, সব গেল! পেটের ছেলে অনেক দিন হলো চলে গেছে, পরের ছেলেকে ঘরে এনে তাকে লালনপালন করে রাণীসাহেবা ভাঙ্গা মন কোন প্রকারে জোড়া দিয়েছিলেন, দিন-রাত প্রজাদের "মা মা" ডাক শুনে কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে কেবল দত্তকের মুখের দিকে চেয়ে একেবারে সন্ন্যাসিনী না সেজে রাজ্যের উদ্বেগ অশান্তি মাথার বোঝা করে নিয়েছিলেন। আজ সব ঘুচে গেল! ঘরের ধন পরকে দিয়ে পেটের ভাতের জন্যে ইংরেজের দয়ার উপর নির্ভর করে অনাথা কাঙ্গালিনীর মত তিনি কোন্ প্রাণে ঝাঁসির ভাঙ্গা হাটে আবার বাতি জ্বালবেন?—কোন্ প্রাণে পোড়া মুখ পরকে দেখাবেন? এই ভাবনা ভেবে ভেবে তিনি নিতান্তই অস্থির হয়ে পড়লেন। তাই তিনি ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করে, বুকের পাটা শক্ত করে দাঁড়ালেন।

এরপর একদিন ইংরেজ অধিনায়ক যখন আদেশ পাঠালেন, "ঝাঁসি ছেড়ে দাও", রাণী লক্ষ্মীবাঈ তখন হুঙ্কার ছেড়ে ইংরেজ প্রতিনিধির মুখের উপর বলে উঠ্‌লেন—"মেরি ঝাঁসি নেহি দেওঙ্গে।"

মানুষ কিছুতেই আশা ছাড়তে পারে না। ইংরেজের ন্যায়-বুদ্ধির উপর রাণীর খুব বিশ্বাস ছিল; আরও তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিধবার করুণ ক্রন্দনে ইংরেজের প্রাণও কাঁদ্‌বে। তাই তিনি বড় আশায় বুক বেঁধে তাঁর কাতর প্রার্থনা জানাবার জন্যে বিলাতে দু'জন লোক পাঠালেন। কিন্তু নিয়তির খেলা কে বুঝবে? কপালের দোষে বিলাতের কর্ত্তারা রাণীর কথা কিছু জান্‌তে পারলেন না। বিলাত থেকে হুকুম জারী হলো,—"বড়লাটের আদেশ মঞ্জুর। ঝাঁসি ইংরেজের।"

পাঁচ

এ কথা আজ আর কারো অজানা নেই যে, ইংরেজ বেনিয়া জাতি, ব্যবসা করতে তারা এসেছিল। ক্রমশঃ লাভের অঙ্কই তাদের সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায় হয়ে দাঁড়ালো। এর পর শোষণ ও সাম্রাজ্য-বিস্তারই হলো তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তার ফলে বহু বিশিষ্ট ভারতীয়ের বুকে ইংরেজ-বিদ্বেষ জমা হয়ে ওঠে। তারা তখন ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ-প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

সেই ইংরেজ-বিদ্বেষ সহসা একদিন আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত প্রবাহের মত বাংলাতেই ফেটে বেরিয়ে পড়লো সকলের আগে! বাংলার সেই মুক্তি-আন্দোলনই ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে গেল, ইংরেজের মান-মর্য্যাদা ও জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলো!

ইতিহাসে আজও তা ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহ নামে পরিচিত হয়ে আছে!

বাংলার সিপাহীরাই ক্ষেপে উঠলো সকলের আগে। তারা হুড়্ হুড়্ করে কেল্লার দরজা ভেঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যে কোন ইংরেজ একবার সিপাহীদের সাম্নে পড়লেই আর রক্ষা ছিল না। তলোয়ারের ঘায়ে সাদা শরীর মুহূর্ত্তে রাঙ্গা হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেতো!

ঝাঁসিতে ইংরেজ-সরকারের যাঁরা কর্ত্তা ছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ঝাঁসির সিপাহীরা কখনও বিদ্রোহে যোগ দেবে না। ঝাঁসির রাণী হিন্দু বিধবার সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করে ইষ্টদেবের আরাধনায় দিন-রাত যাপন করছেন। তিনি ধীর স্থির,—কোন প্রকার চঞ্চলতা তাঁর চিত্তকে বিচলিত

করেনি। যাঁর মনে এতটা সহিষ্ণুতা, এতটা উদারতা, এতটা ধর্ম্মভাব, তাঁর অধিকারের ভিতর কোন প্রকার অধর্ম্মের অভিনয় হতে পারে না।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন ঝাঁসিতেও জ্বলে উঠলো—ঝাঁসির সিপাহীরা খোলাখুলিভাবেই বিদ্রোহী হলো। কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে বন্দুক, বারুদ, গোলা, টাকা-পয়সা, যা কিছু পেল, সমস্তই লুটে নিয়ে গেল। ইংরেজ সেনাপতি বিদ্রোহীদের গুলিতে প্রাণ দিলেন।

সহরের বাইরে বাইরে ছাউনীর মধ্যে অনেক ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। কমিশনার সাহেব ও আরও কয়েকজন বড় বড় ইংরেজ কেল্লার ভিতরে নিজের নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রাণরক্ষার ও নিজেদের জাতির ও দেশের মানরক্ষার জন্য ভেবে ভেবে অধীর হয়ে পড়লেন। ছাউনীর ইংরেজদের বধ করে বিদ্রোহীরা কেল্লা আক্রমণ করলো। সে অতি ভীষণ আক্রমণ। আত্মরক্ষার জন্য সাহেবেরা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

এমন সময়ে আর কোন উপায় না দেখে রাণীর সাহায্য ভিক্ষার জন্য কয়েকজন ইংরেজ প্রাণ হাতে নিয়ে রাণীর নিকট যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে তাঁদের কাটা মুণ্ড রাস্তায় লুটিয়ে পড়লো।

রাণী তাঁর নিজের বাড়ীতে অনেক ইংরেজ মহিলাকে স্থান দিয়েছিলেন। যতটা সম্ভব, তাঁদের খাওয়া-দাওয়ারও ভাল বন্দোবস্ত করেছিলেন। যে ঘরে মহিলারা ছিলেন, কয়েকজন বাছা বাছা পাহারাওয়ালা অস্ত্র নিয়ে সে ঘর দিনরাত পাহারা দিত। রাণীর কিন্তু সর্ব্বদাই একটা ভয় বড়ই বেশী রকম ছিল, কোন্ দিন না-জানি বিদ্রোহীরা এসে বলে বসে, হয় টাকা দাও, না হয় মাথা দাও।

বিদ্রোহের সাংঘাতিক অবস্থা দেখে রাণীর বুক দুর্ দুর্ করে উঠলো, তাঁর কোমল প্রাণ আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। বড়ই ইচ্ছা ছিল—এই ঘোর দুর্দ্দিনে ইংরেজদের সাহায্য করে প্রাণে বাঁচান। কিন্তু এখন আর তাঁর সে শক্তি ছিল না। হাজার হাজার ক্ষিপ্ত সিপাহীদের দমন করার ক্ষমতা তাঁর আর নাই। তিনি কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। অথচ বিপন্ন ইংরেজদের জন্যে তাঁর প্রাণ হাহাকার করতে লাগলো। তিনি যখন যেটুকু পারলেন, বিপন্নদের সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হলেন না।

বিদ্রোহীরা যখন দিল্লীর দিকে চলে গেল, তখন তিনি সাহেবদের মৃতদেহ উঠিয়ে এনে কবর দেওয়ালেন। দু' চার জন ইংরেজ যাদের প্রাণরক্ষা হয়েছিল, তিনি তাদের খোঁজ নিয়ে তাদের জন্যও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন। ইংরেজই লিখে গেছে, বিদ্রোহের হত্যাকাণ্ডে রাণীর কোনই দোষ ছিল না, বরং তিনি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়ে যতটা সম্ভব ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিলেন ও করতে প্রস্তুত ছিলেন।

এদিকে বিদ্রোহীরা রাণীকে লিখে পাঠালো, "অন্ততঃ কয়েক লক্ষ টাকা দিতে হবে, কোন অজুহাত শোনা হবে না। হয় টাকা দাও, না হলে সর্ব্বনাশের জন্যে প্রস্তুত থাক। কোন ওজর-আপত্তি শোনা হবে না।"

লক্ষ্মীবাঈ যা ভেবেছিলেন তাই হলো। তিনি কি করবেন কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। নিজের অভাবের কথা, দুঃখের কথা, অক্ষমতার কথা বারে বারে বিদ্রোহীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সমস্তই বৃথা হলো। কে শোনে তাঁর কথা?

অগত্যা রাণী আর কি করবেন! বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের টাকা দিয়ে বিদায় করতে হলো। টাকা পেয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা

আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলো, "মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহকা, অম্মল (আমল) রাণী লক্ষ্মীবাঈকা !"

এই ব্যাপারে ইংরেজদের ধারণা হলো, রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিশ্চয়ই বিদ্রোহে যোগদান করেছেন, কাজেই তিনি ইংরেজের শত্রু !

ছয়

এই ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইংরেজের হয়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিজেই ঝাঁসি শাসন করতে লাগলেন ; কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা, না-জানি কখন্ কোন্ বিপদ্ এসে উপস্থিত হয় !

বিপদ্ একদিন এলো বটে সত্যই, কিন্তু সে বিপদ্ বিদ্রোহী সিপাহীদের কাছ থেকে এলো না, এলো অন্য দিক্ থেকে !

ঝাঁসির সিংহাসনের দিকে সদাশিব রাও নামে এক ব্যক্তির বিশেষ লোভ ছিল। লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসি রাজ্য নিজ হাতে নিয়েছেন, এই সুযোগে সে তার পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রস্তুত হলো। সদাশিব একটা কেল্লা দখল করে দেশে ঘোষণা করে দিল, ঝাঁসি তার রাজ্য, সে-ই ঝাঁসির প্রকৃত রাজা। কিন্তু রাণীর সৈন্যগণের আক্রমণে শেষে অস্থির হয়ে সে প্রাণভয়ে পলায়ন করে। সৈন্যগণ তাকে বন্দী করে ঝাঁসিতে নিয়ে এলো।

এক বিপদ্ যেতে না-যেতে আর এক বিপদ্ উপস্থিত ! বিপদ্ যখন আসে, দল বেঁধেই এসে থাকে, কখনো একা আসে না। বোরছা দেশে এক রাণী ছিলেন। অনেক দিন আগে ঝাঁসি ছিল বোরছার রাজারই রাজ্য, কাজেই ঝাঁসির সিংহাসনের জন্য বোরছার ছিল এক প্রচণ্ড লোভ ! ঝাঁসি

এখন রাণীর হাতে, ইংরেজ আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, এই সুযোগে বোরছার দেওয়ান নথে খাঁ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসির কাছে একটা নদীর তীরে এসে ছাউনী করলেন।

তিনি রাণীকে লিখে পাঠালেন, "মহারাণী, তুমি এখন বিধবা, ছেলে মরে গেছে। পরের ছেলে ঘরে এনে তাকে রাজা করে তোমার মনের জ্বালা কমবে কি? সূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত-মণি, দুটো পৃথক জিনিষ। বিশেষতঃ, তোমার রাজ্যের এখন প্রয়োজনই বা কি? তা ছাড়া, নিশ্চয় জেনো, ইংরেজ কাদা-মাটি নয়। দুদিন পরে তার সিংহাসন সে আবার নিয়ে যাবে। তুমি পাবে শুধু একটা বৃত্তি মাত্র। আমরাও তোমাকে সেই বৃত্তি দিতে রাজি আছি। আমাদের ঝাঁসি আমাদের ছেড়ে দিয়ে হিন্দু বিধবার মত তুমি এখন ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দাও।"

চিঠি পড়ে রাণীর মনে অত্যন্ত কষ্ট হলো, রাগও হলো।

তিনি নথে খাঁর নিকট লিখে দিলেন, "আমি রমণী বটে কিন্তু বীর-রমণী। ব্রাহ্মণের ঘরে আমার জন্ম, কাশীতে আমার ধুলো-খেলা, শিবরাও ভাউর আমি পুত্রবধূ। বীরত্বে ঝাঁসির সিংহাসন-লাভ, বীরত্বেই এর রক্ষা অথবা শেষ হবে। আমার মাথা না কেটে এ সিংহাসন কেউ নিতে পারবে না। মনে রেখো, আমি রমণী হলেও তোমাদের মত অনেক পুরুষকে আমি শায়েস্তা করতে পারি। এ বাহুতে সে শক্তি আছে, এ হৃদয়েও সে তেজ আছে।"

এই উত্তর পেয়ে নথে খাঁ অবাক্ হলেন, রাগে ও অপমানে দিশেহারা হলেন। তিনি ক্ষেপা কুকুরের মত হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসির দিকে ছুটলেন। রাণী দেশের মাতব্বরদের ডেকে এনে তাঁদের মত জিজ্ঞাসা করলেন। সকলেই দেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হলো।

দেশের লোকের উৎসাহ পেয়ে, নিজের সাহসের উপর নির্ভর করে রাণী গোলা-বারুদের কারখানা খুল্লেন; দলে দলে সৈন্য যোগাড় করতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি যে রকম উৎসাহ ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, জগৎ চিরদিন সে কথা স্মরণ করবে।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ঝাঁসির সৈন্যদের প্রচণ্ড গোলার আঘাতে বোরছার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। রমণীর বীরত্বের কাছে সেকালের একজন বীর পুরুষের বীরত্ব হার মানলো। বোরছার পক্ষ থেকে সন্ধির কথা উঠলো। রাণী রাজী হলেন। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে তিনি বোরছার রাণীর সঙ্গে মিটমাট করে ফেল্লেন।

সাত

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বড়ই বিশ্বাস ছিল, ইংরেজ তাঁর কাজকর্ম্মে সন্তুষ্ট আছেন। ইংরেজ যখন আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তখন তিনি তাঁদেরই নামে, তাঁদেরই নিশান উড়িয়ে ঝাঁসি শাসন করেছেন, ভাঙ্গা নৌকা তীরে এনে কোন মতে জোড়া দিয়ে রেখেছিলেন। বোরছার ভীষণ আক্রমণ—তাও তিনি বাধা দিয়েছিলেন। আশা ছিল, বুঝি বা ইংরেজের দয়া হয়, বুঝি বা তাঁর একমাত্র সম্বল দামোদর রাও ঝাঁসির গদী পুনরায় ফিরে পায়! কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর! ইংরেজ তাঁকেই সন্দেহ করলো সবচেয়ে বেশী! তারা এবার খোলাখুলি ভাবে ঝাঁসি আক্রমণ করে বসলো।

ইংরেজের সৈন্যসংখ্যা খুব বেশী; তার উপর আবার তাঁদের সেনাপতি

স্যার হিউ রোজ। ঝাঁসির সৈন্য তত বেশী ছিল না। কাজেই রাণী ঠাকুরাণী সমস্ত ভার নিজের হাতে নিলেন।

ইংরেজ কয়েকটি কেল্লা দখল করে যখন ঝাঁসির কাছে এলো তখন রাণীর কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁকে বল্ল, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশ হবে, ইংরেজকে বাধা দেওয়ার দরকার নাই। বুঝবার ভুলেই গোল বেধেছে। শীগ্‌গিরই ইংরেজ সেনাপতির কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে বোঝান যাক্, কি মস্ত বড় একটা ভুল ধারণা তাঁদের হয়েছে! যুদ্ধের ভীষণ পরিণাম থেকে ঝাঁসি রক্ষা পেয়ে যাবে।

ঝাঁসি যাতে মহাশ্মশানে পরিণত না হয়, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরাণো কর্ম্মচারীরা সেজন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নূতন এক দলের, বিশেষতঃ নূতন সৈন্যদের ছিল ইংরেজের উপর বিদ্বেষ। তারা ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে হিতে বিপরীত বুঝে, পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের বিকট হুঙ্কারে ঝাঁসি কেঁপে উঠলো, রাণীর প্রাণ দুর দুর্ করে উঠলো, ইংরেজের সঙ্গে ঝাঁসি রাজ্যের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

সুদক্ষ ইংরেজ সেনাপতি ঝাঁসির কেল্লা ও সহর দখল করার জন্য স্থানে স্থানে বাছা বাছা সৈন্য ও তোপ স্থাপন করলেন। প্রকাশ্যে যুদ্ধ চললো, উভয় পক্ষের তোপের শব্দে ভূমিকম্পের মত শুধু ঝাঁসি নয়, ঝাঁসির চারদিকের কত নগর, কত দেশ ঘন ঘন কেঁপে উঠলো। ঝাঁসির সৈন্যেরা এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল যে, ইংরেজ সৈন্য সে তোপের ধারে টিক্‌তে না পেরে পিছু হটে গেল। রাত হওয়ায় যুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু প্রভাত হতে না হতে ঝাঁসির সৈন্যেরা ইংরেজ সৈন্যের উপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। গোলা-বর্ষণে ইংরেজ সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো। তবু তারা মরিয়া হয়ে মুহুর্মুহুঃ কামানের গোলা-বর্ষণে

নগরবাসী সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করে তুললো ! সহরের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। গোলার আঘাতে অনেক খুন-জখম হলো। অনেকের বাড়ীঘর পুড়ে ছারখার হলো। খাদ্যাভাবে চারিদিকে হাহাকার উঠলো।

সহরের এই অবস্থা দেখে রাণী লক্ষ্মীবাঈ অত্যন্ত কাতর হলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে সকলের অবস্থা দেখতে লাগলেন, দেখেন আর কাঁদেন। যাদের ঘর ছিল না, খাবার ছিল না, তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন, অন্নসত্র খুলে দিলেন। অন্যদিকে আবার সৈন্যেরা বিশেষ ভয় পাওয়ায় তিনি কখনো উৎসাহ, কখনো বা অর্থ দিয়ে, তাদের প্রাণে এক নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করতে লাগলেন।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, যুদ্ধের আর বিরাম নেই। আট দিনের দিন একটা প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হলো। সেদিনের গোলাবৃষ্টিতে, কামান-বন্দুকের ভীষণ শব্দে, বাদ্যের ঝন্‌ঝনায়—সারা ভারত কেঁপে উঠলো, স্বর্গও বোধ হয় শিউরে উঠেছিল! ইংরেজ নিশ্চয়ই কখনো মনে করেনি ঝাঁসিতে গিয়ে তাদের এত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে! তার ওপর কতকগুলি নূতন সৈন্য এসে ঝাঁসির সৈন্যদল বৃদ্ধি করলো। এরা সবাই নানা সাহেবের সৈন্য, মহাবীর তাত্যার অধীনে ঝাঁসির দ্বারে উপস্থিত।

ইংরেজের বড়ই ভয় হলো। একে ত তাঁদের সৈন্য ছিল কম, তার উপর আবার এতগুলি নূতন সৈন্যের আগমন ! এতগুলি সুদক্ষ সৈন্য হঠাৎ এসে পড়ায় ইংরেজের জয়ের পথে অনেকটা কাঁটা পড়লো।

নানা সাহেব ও তাত্যা-টোপে দু'জনই সেকালের দুটি বড় বীর। ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা সাহেবের অভিযোগ, ইংরেজ তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের যে বৃত্তি দিত, সে বৃত্তি তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। নানাসাহেব তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন।



ঝাঁসির সৈন্যবল বৃদ্ধি করতে নানা সাহেবের সৈন্যদল ও আরো কতক নূতন সৈন্য এসে ঝাঁসির দ্বারে উপস্থিত হলো।

আর তাত্যা-টোপে? ইনি নানা সাহেবেরই সেনাপতি। তাত্যা জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ী মহারাষ্ট্রে। তিনি খুব বীর ছিলেন। মহারাষ্ট্রের গৌরব, ভারতের গৌরব শিবাজীর মত তাঁরও কলমের বিদ্যা ছিল না, অস্ত্রের বিদ্যা খুব বেশী ছিল। ইংরেজের সঙ্গে তিনি কখনো সাম্‌না-সামনি যুদ্ধ করতেন না। ইংরেজ সৈন্যের পিছনে পিছনে গিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করতেন। আবার নিজের সৈন্য নিয়ে নিজে পিছু হটে আসতেন। এই ভাবে তিনি ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন।

তাত্যা-টোপেকে এতগুলি সৈন্য নিয়ে আসতে দেখে ঝাঁসির সৈন্যদের মধ্যে মহা আনন্দের রোল পড়ে গেল। তারা আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। রণবাদ্যে যুদ্ধক্ষেত্র ঝম্‌ঝম্ করে উঠলো। উৎসাহ, উত্তেজনার আর শেষ নেই। রাণীর মুখে আর আহ্লাদ ধরে না—তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন!

দশ দিন হয়ে গেছে—আজ যুদ্ধের এগার দিন। চতুর ইংরেজ সেনাপতি কতকগুলি সৈন্য সরিয়ে ফেল্লেন। তাত্যা মনে করলেন, ইংরেজের সৈন্য অতি কম, বিশেষ চিন্তার কোন কারণ নাই। ভীষণ রকম যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ইংরেজ সৈন্য এতদিন ঝাঁসি ঘেরাও করে ছিল, তাদের তাড়াবার জন্যে তাত্যা একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ইংরেজ ঘোড়সওয়ারের প্রবল আক্রমণে তারা হটে গেল। অনেকে মারাও গেল। একে গোলা-বর্ষণ, তার উপর ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকের আক্রমণ—ঝাঁসির সৈন্য আর টিক্‌তে পারলো না। ইংরেজ ক্রমে ক্রমে এগিয়ে বিপক্ষের অনেক গোলাবারুদ হাত করলো, অনেক রকম অস্ত্র-শস্ত্রও পেল তারা। আশায় ও আহ্লাদে, ইংরেজ তখন মাতোয়ারা!

আট

যুদ্ধের এখনো শেষ হয় নি। আরও অনেক বাকী আছে। রাণী এখনও বেঁচে আছেন। ঝাঁসি এখনও রাণীর হাতে।

তুই এক দিন নয়, এগার দিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলেছিল। ইংরেজ বিশেষ কিছুই করতে পারে নাই। ইংরেজেরও বহু সৈন্য মারা গিয়েছিল, গোলাগুলিও অনেক ক্ষয় হয়েছিল। যদি তাত্যা-টোপের সৈন্যেরা অনেক গোলাগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে না যেত এবং সেগুলি ইংরেজের হাতে না পড়তো, তা হলে জানি না যুদ্ধের শেষটা আর এক রকম হতো কি না! ইংরেজের বরাত জোর। সেনাপতি রোজ সাহেব ঠিক করলেন, যেমন করেই হোক্ ঝাঁসি সহরের ভিতর প্রবেশ করতেই হবে।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, তাঁর সৈন্যগণ নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়েছে। আর জয়ের আশা নাই। এরূপ অবস্থা দেখে তিনি বড় বড় সর্দ্দারদের সংবাদ দিলেন। সংবাদ পেয়ে তারা বিদ্যুতের মত ছুটে এলো।

রাণী ঠাকুরাণী অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তাঁদের সম্বোধন করে বল্লেন, "বন্ধুগণ, বেশী আর কি বলবো, ঝাঁসির তুর্দ্দশা দেখে প্রাণ বড়ই কাতর হচ্ছে। পুত্র নাই, স্বামী নাই, রাজ্য নাই, আছে শুধু চোখের জল, আর জপের মালা। তা-ই সম্বল করে—ভগবানের নামে বিদ্রোহের আগুন নিভাবার জন্যে, বিপন্নের বিপদ দূর করার জন্যে, কতই না চেষ্টা করেছি! কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। ইংরেজ আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে—বিদ্রোহীদের পরম বন্ধু মনে করে আমার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তার ফলে ঝাঁসি আজ বিপন্ন ! তবু যেমন করে হোক্, কোন রকমে এগার দিন পর্য্যন্ত এই ভীষণ যুদ্ধ আমরা চালিয়েছি। কিন্তু যে অবস্থায় এসে পড়েছি, আর বুঝি মান থাকে না ! এখন পর্য্যন্ত তোমরা নিজেরা নিজের পায়ে ভর করে যে রকম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ, শেষ পর্য্যন্ত যেন তা বজায় থাকে ! জয়-পরাজয় ভগবানের হাতে। কিন্তু জগৎ বুঝুক, ঝাঁসিতে বীরের অভাব নাই।"

নয়

দুই পক্ষেই ভীষণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ হলো। মহা বিক্রমে ইংরেজ সৈন্য হুড়্ হুড়্ করে ঝাঁসি সহরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঝাঁসির সৈন্য তাদের আর বাধা দিতে পারলো না। ইংরেজ রাজবাড়ী দখল করলো। গোরা সৈন্য সহরের পথে পথে হল্লা করতে লাগলো, লুঠতরাজ আরম্ভ হলো।

সহর ও রাজবাড়ী গোরার হাতে এলো, সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় সেনাপতি সকলেই অন্তর্হিত হয়ে গেলো ! এখন একা রাণী কি করবেন ? তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, ইংরেজের হাতে পড়ার চেয়ে খাঁড়ার আঘাতে নিজের মাথা নিজে কেটে এই দুঃখের জীবন শেষ করা অনেক ভালো।

এই ঠিক করে তিনি সকলকে ডেকে বল্লেন, "যে রকম দেখ্‌ছি, কেল্লা আর রক্ষা হয় না ! ইংরেজ কেল্লা অধিকার করে আমাদের ধরে ফেলবে, তারপর কি করবে, বলতে পারি না। কিন্তু আমি আমার দেহ কখনো গোরাকে স্পর্শ করতে দেব না। রাজ্য গেছে, মান গেছে, প্রাণ যাবে সেও

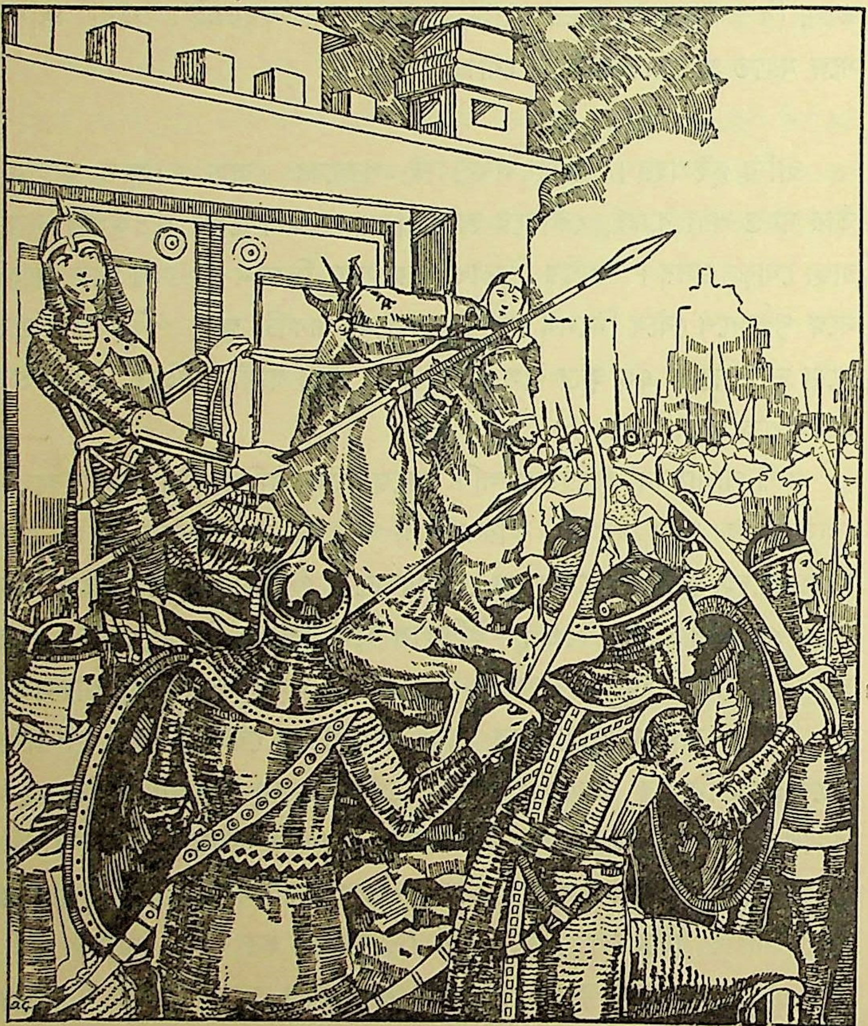
ভাল, কিন্তু ইংরেজের হাতে আমি ধরা দেব না কিছুতেই। যারা আমার সঙ্গে মরতে চাও, তারা এসো, বেরিয়ে পড়ো।"

রাত্রি দুইপ্রহর। রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের বেশে সজ্জিত হলেন। তাঁর সমস্ত শরীরে বর্ম্ম, কোমরে তলোয়ার। সঙ্গে নিলেন কতকগুলি বাছা বাছা ঘোড়সওয়ার। রাণীর পিতাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাণী তাঁর দেহের সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে বেঁধে নিলেন রেশমী কাপড়ের একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলী। তার মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত এক ক্ষুদ্র বালক! এ যে তাঁর স্বামীর গচ্ছিত ধন—তাঁর দত্তক পুত্র দামোদর রাও!

রাণী পালালেন, ইংরেজরা অতি সহজে এসে ঝাঁসির কেল্লা দখল করলো। কেউ তাদের বাধা দিল না, কারুর সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে হলো না। বেশ নির্ব্বিবাদেই ইংরেজ সৈন্যের দল কেল্লায় ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো এক বিরাট হত্যাকাণ্ড। ইতিহাস বলে, ইংরেজ সৈন্য সেদিন পাঁচ হাজার নিরীহ অধিবাসীর রক্তে ঝাঁসির রাজপথ কর্দ্দমাক্ত করে তুলেছিল!

এদিকে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বাবা মোরোপন্ত ঘোড়ায় চড়ে পালাতে গিয়ে হঠাৎ নিজের তলোয়ারের এক খোঁচা খেয়ে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি আর পালাতে পারলেন না। ঐ অবস্থায় তিনি দতিয়া রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু দতিয়ার রাজমন্ত্রী তাঁকে ইংরেজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হলো।

এদিকে মহারাণী ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলেন নানা সাহেবের ভাইয়ের বাড়ীতে। কিন্তু মহারাণীর পুরুষের মত পোষাক, গায়ে যুদ্ধের সাজ দেখে নানা সাহেবের ভাই একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন! বুঝে উঠতে পারলেন না কে এই বীরবালা?



সৈন্যদের উৎসাহ দেবার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে উপস্থিত হলেন।

নানা সাহেবের ভাইয়ের এই অপ্রতিভ অবস্থা দেখে লক্ষ্মীবাঈ নিজেই তাঁর পরিচয় দিলেন। কাজেই আবার যুদ্ধের আয়োজন সুরু হয়ে গেল। এবার রাণীর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন পেশোয়া।

'হর হর বম্ বম্' শব্দে পেশোয়ার সৈন্যরা বিপুল বিক্রমে ইংরেজের গোলাগুলির মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। কিন্তু ইংরেজের গোলার সামনে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? পেশোয়ার সৈন্যেরা শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো, পেশোয়া নিজেও পালাবার চেষ্টা করলেন।

সৈন্যদের দুর্দ্দশা দেখে মহারাণী আর স্থির থাকতে পারলেন না—তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ইংরেজরাও মনে মনে তাঁকে প্রশংসা না করে থাকতে পারলো না।

রাণীর বীরত্বের পরিচয় পেয়ে স্যার হিউ রোজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন—"রাণী লক্ষ্মীবাঈ মেয়েমানুষ হলেও, বিপক্ষদলের মধ্যে তিনিই সকলের চেয়ে বেশী সাহসী ও যুদ্ধে পটু ছিলেন।"

কিন্তু ইংরেজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন—এবারও তাদেরই জয় হলো।

রাণী সাহেবা, তাত্যা-টোপে ও পেশোয়া নানারূপ পরামর্শ করে ঠিক করলেন, একটা কেল্লা অধিকার করা চাই। গোয়ালিয়র রাজ্যের সঙ্গে পেশোয়ার খুব বন্ধুত্ব ছিল। গোয়ালিয়রের রাজা মারাঠার মান রক্ষার জন্যে অবশ্যই সাহায্য করবেন, এই বিশ্বাসে সকলে একত্র হয়ে গোয়ালিয়র রাজ্যের কাছে এক ছাউনীতে এসে উপস্থিত হলেন।

———

দশ

গোয়ালিয়র রাজ্য তখন এক যুবকের হাতে। তাঁর বুদ্ধি ছিল, যুদ্ধও বেশ ভালবাসতেন ; কিন্তু বিলাসিতা তাঁর হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছিল। রাজা যখন বিলাসী হয়, তখন রাজ্যের হাল ঠিক থাকে না। তাই ইংরেজ সরকার রাজ্যরক্ষার ভার দিয়েছিলেন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ দেওয়ান দিনকর রাওএর উপর।

গোয়ালিয়র ইংরেজের ছায়ায় প্রতিপালিত, বর্দ্ধিত। সত্যি বটে, গোয়ালিয়রের অনেক সৈন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু রাজা নিজে ইংরেজের খুব বাধ্য ছিলেন, থাকার কথাও বটে। পেশোয়া এই গোয়ালিয়র-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু রাজা পেশোয়াকে সাহায্য করতে রাজী হলেন না। তখন দুইপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ঘরে ঘরে যুদ্ধ—দেখবার ও ভাববার বিষয় বটে! রাণীসাহেবা এ যুদ্ধেও বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। গোয়ালিয়রের পরাজয় হলো। রাজা মন্ত্রীকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর গদীতে চড়ে বস্‌লেন রাওসাহেব পেশোয়া।

কিন্তু ইংরেজ আজ গোয়ালিয়রের পক্ষে। পেশোয়ার শক্তি কতটুকু ?

পেশোয়া বেশ নিশ্চিন্তে রাজা হয়ে বসেছিলেন, নতুন রাজত্ব পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা, মাতোয়ারা! এদিকে যে সিংহের বিক্রমে ইংরেজ তাঁর দিকে ছুটে আস্‌ছে—সে খবর তিনি রাখেন না!

ইংরেজরা আসছে খবর পেয়ে পেশোয়া ব্যস্ত হয়ে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। ইংরেজদের পরাক্রমের কথা পেশোয়া বেশ ভালো ভাবেই জানতেন। এইজন্য তিনি রাণীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

স্যার হিউ রোজ ১৭ই জুন গোয়ালিয়র আক্রমণ করলেন। কিন্তু রাণীর সৈন্যদের অসীম বীরত্বে ইংরেজ সৈন্যরা প্রথমে কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে পেরে উঠলো না, তারা হটে গেল।

সেনাপতি স্যার হিউ রোজ চিন্তিত হলেন। যাহোক, অতি অল্প সময়েই তিনি তাঁর রণনীতি পরিবর্ত্তন করে ফেল্লেন। তারপর অসীম উৎসাহে সৈন্যদের উৎসাহিত করে তিনি আবার আক্রমণ করলেন। গোরা সৈন্যরা এবার দ্বিগুণ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ সারাদিন যুদ্ধ করে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে, তিনি নিজের বিশ্বস্ত পরিচারিকা মুন্দরা ও কাশীকে নিয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন।

হয়তো তিনি পালিয়ে যেতে পারতেন স্বচ্ছন্দেই। কিন্তু সহসা চীৎকার শুনে তিনি ফিরে দেখেন, মুন্দরার কাটামুণ্ড মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে!

রাণী যেন দেহে তাঁর শত বৃশ্চিক দংশন অনুভব করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরে তলোয়ারের আঘাতে ঘাতকের মাথা কেটে ফেল্লেন। তারপর তক্ষুনি আবার তিনি ছুটে চল্লেন।

ঘোড়া একটা খালের ধারে এসে থম্‌কে গেল। তারপর খাল পার হওয়ার জন্য ঘোড়া কতবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলো না। সেই সময় এক গোরা সৈন্য রাণীর পেছনে ছুটে এসে তাঁর মাথার উপর তলোয়ারের এক ঘা মারল। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর মাথাটি দুখণ্ড হয়ে গেল, একটা চোখ তাঁর বেরিয়ে পড়লো! কিন্তু বীর রমণীর তেজ তখনো বিন্দুমাত্র কমেনি! ছিন্নমস্তা দেবী যেন নিজের রক্তে স্নান করে নিমেষের মধ্যে নিজ হাতের তলোয়ার দিয়ে গোরার মাথা কেটে ফেল্লেন।

কিন্তু গোরা সৈন্যের গুরুতর অস্ত্রের আঘাত রাণী আর বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর চিরসাধের ঝাঁসিকে পরিত্যাগ করে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে তিনি অনন্তধামে চলে গেলেন।

সুদীর্ঘ কতকাল আগে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু হয়েছে। তবু আজ প্রায় শতবর্ষ পরেও তাঁর নাম ভারতের প্রতিটি মর্ম্মস্থলে অক্ষয় হয়ে গাঁথা আছে!

শেষ